Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হালিমা জান্নাত হাফসা

রোলঃ 227020444

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হালিমা জান্নাত হাফসা

রোলঃ 227020444

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হালিমা জান্নাত হাফসা, আইডিঃ 227020444 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

হালিমা জান্নাত হাফসা

(স্বাক্ষর)

হালিমা জান্নাত হাফসা

আইডিঃ 227020444

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

নামাজের পরিচয় 5

কুরআন ও হাদিসে নামাজ 6

হাদীসে সালাত 8

নামাজ পরিত্যাগের বিধান 10

নামাজ ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। 11

নামাজ পরিত্যাগকারীর ফাতওয়ার ভিত্তিতে কতিপয় বিধান আরোপ হয় 12

নামাজের সময় 14

নামাজের মকরুহ সময় 18

নামাজের মুস্তাহাব সময় 24

নামাযের সময় নির্দিষ্টী করণের পশ্চাতে হিকমত 25

নামাজের আহকাম সমূহ 26

নামাজের আরকান সমূহ 28

নামাজের গুরুত্ব 30

আল্লাহর যিকরের জন্য সালাত বা নামাজ: 32

বে-নামাযীর পরিণতি 35

নামাজের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি 39

নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় উপকারিতা, ফলাফল ও ফযীলত 46

উপসংহার 56

ভূমিকা:

নামাজ বা **নামায** (ফার্সি: نماز) বা **সালাত** বা **সালাহ** (আরবি: صلاة) ইসলাম ধর্মের একটি দৈনিক নিয়মিত ইবাদত। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করতে হয় যা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত আছে। এটি মুসলমানদের জন্য প্রতিদিন অবশ্যকরণীয় একটি ধর্মীয় কাজ। তবে প্রতিদিন আবশ্যকরণীয় বা ফরজ ছাড়াও বিবিধ নামাজ রয়েছে যা সময়ভিত্তিক বা বিষয়ভিত্তিক। ইসলামে ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ না পড়া কবিরা গুনাহ বা বড় পাপ।সালাত একটি সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির ইবাদত যার পদ্ধতি 'ইসলামী শরীয়তে পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। নামাজ 'তাকবিরে তাহরিমা' দ্বারা শুরু হয় ও 'সালাম ফিরানো' দ্বারা শেষ হয়'।

নামাজ (সালাত) ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে দ্বিতীয় রোকন। নামাজ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ বা অবশ্যকরণীয়। পবিত্র কুরআনের ৮২ টি আয়াতে বলা হয়েছে সালাত প্রতিষ্ঠা করো।

নামাজের পরিচয়

নামাজ শব্দটি ফার্সি শব্দ। আরবীতে নামাজকে সালাত (صلاة) বলে।

صلاة এর আভিধানিক অর্থ :

দোয়া, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

ইসলামি পরিভাষায়, আহকাম, আরকানসহ বিশেষ নিয়মে ও নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর ইবাদাত করার নাম সালাত (নামাজ)। ইসলামে নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের মধ্যে সালাত(নামাজ) দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন। পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ: 'এবং তোমরা নামায কায়েম করো ও যাকাত আদায় করো।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত; এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর (আল্লাহ তা'আলার) বান্দা ও রাসুল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, হজ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।' (বুখারি ও তিরমিজি)

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান পুরুষ এবং নারীর ওপর নির্ধারিত সময়ে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সালাত আদায়ের নির্দেশনা

দিয়েছে ইসলাম। মহানবি (সা.) বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স ১০ বছর হয়, তখন সালাতের ব্যাপারে (প্রয়োজনে) শাসন করো।' (আবু দাউদ)

কুরআন ও হাদিসে নামাজ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা কুরআন মাজীদের আরো আয়াতে আছে।

◯ফজর, মাগরীব, এশা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وأقم الصلاة طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِين.

আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত আদায় করবে এবং রাতের প্রান্তভাগে। পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।" (সূরা হুদ-১১৪).

◯মাগরীব, এশা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়।" (বনী ইসরাঈল, ৭৮)

◯ফজর, যোহর, আসর, মাগরীব, এশা।

সূরা রূমে আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَسَبِّحْنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُون، و له الحمد في السموت والأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهَرُون-

তোমরা আল্লাহর তাসবীহতে রত থাক যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা ভোরের সম্মুখীন হও। এবং তাঁরই প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। বিকেল বেলায় (তাঁর তাসবীহতে রত হও) এবং যোহরের সময়। -সূরা রুম (৩০): ১৭-১৮

আমরা এখানে মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক থেকে সনদসহ উল্লেখ করছি-

عن الثوري، عَنْ عَاصِمٍ، عَن أبي رزين قال: خاصَمَ نَافِعُ بن الأزرق ابْنَ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْقُ؟ فَقَال: نعم، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ فَسُبْحَنَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ الْمَغْرِبُ وَالْفَجْرُ، وَ الْاَشِيْنَ تُسْبِحُونَ الْمَغْرِبُ وَالْفَجْرُ، وَ عَشَعُهُ تُرْعُهُ ونَ : الظهْرُ، قَالَ: وَ مِنْ بَعْدِ صَلوةِ الْعِشَاء

অর্থাৎ নাফে ইবনে আযরাক নামক এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা পেয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। এরপর তিলাওয়াত করলেন,

فَسُبْحَنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسَوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُون(َ

অর্থাৎ) মাগরিব ও ফজর, وَعَشِيًّا : وحِينَ تُظْهِرُونَ : যোহর...

মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, খ. ১, পৃ. ৪৫৪, হাদীস ১৭৭২ -

অতএব এখানে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিবরণ পেলাম। جين تُمْسَوْن-এ মাগরিব ও এশা فو حِينَ تُصْبِحُون َ ফজর, وَ عَشِيًا-এ আসর এবং وَ حِينَ تُظْهِرُون َ-এ যোহর- এই মোট পাঁচ ওয়াক্ত।

◯ ফজর,আসর,এশা।

সূরা রুমের আয়াতের অনুরূপ আয়াত আছে সূরা ত্ব-হায় আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন-

فاسير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناي الَّيْلِ فَسَبحُ وَ أَطراف النهار لعلك ترضى

সুতরাং (হে নবী!) তারা যেসব কথা বলে, তাতে সবর করুন। আর সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ ও হামদে রত থাকুন। রাতের মুহূর্তগুলোতেও তাসবীহতে রত থাকুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। -সূরা ত্ব-হা (২০): ১৩০

হাদীসে সালাত

ক. রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والحج

ইসলাম পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য" وصوم رمضان ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল-এর সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ-এর হজ্ব করা।(' সহীহ বুখারী, ০৮; সহীহ মুসলিম, ১৬)

খ. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নাজদের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমতে আসলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কী বলছিল তা বুঝা যাচ্ছিলো না। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অতি নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

على غير من قال " لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل . عجرة هل على.

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত'সে বলল, এ ছাড়া আমার কোন কিছু (সালাত) আছে কি? তিনি বললেন, না তবে নফল আদায় করতে পার" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-8)

গ. সালাত (নামাজ) হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন এবং পাপ মোচনের নদী: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يقلل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دريه شيء؟ قالوا: لا يبقى من در نه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا
"মনে কর তোমাদের কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে, এতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার

শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে কি? তার বললেন, জি না, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে না। তিনি বললেন, এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ, এর দ্বারা আল্লাহ সকল পাপ মোচন করে দেনা'।(সহীহ বুখারী, ৫২৮; সহীহ মুসলিম ৬৬৭.)

নামাজ পরিত্যাগের বিধান

কালেমার সাক্ষ্য দেওয়ার পর নামাজই ইসলামের অধিকতর গুরুত্ব ও তাগিদপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীক ও উত্তম ইবাদত। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা নামাজ বা সালাতকে ঈমান নামে অভিহিত করেছেন। যেমন তাঁর বাণী:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) [البقرة[143 :

"আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান (সালাত)-কে নষ্ট করে দিবেন।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩]

বিগত শরী'আতসমূহের মধ্য থেকেও কোনো শরী'আত নামাজবিহীন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي) [ابراهيم[٤٠ :

"হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]

এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) [مريم[৩১ :

"এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩১]

এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا((

]مريم[55 :

"সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৫]

যাবতীয় ফরয বিষয় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মারফত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ফরয হয়েছে, কিন্তু নামাজের জন্য তাঁকে আল্লাহর নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কথপোকথন করেন এবং তাঁর প্রতি (পঞ্চাশ) ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেন। অতঃপর তা থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত বাকী রাখা হয় যার নেকী ৫০ ওয়াক্তেরই সমান।

আল্লাহরই সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ।

নামাজ ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة

"মানুষ এবং শির্ক কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য সালাত ছেড়ে দেওয়া"। (সহীহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)

"আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো সালাত। অতএব, যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

প্রখ্যাত তাবেঈ শাকীক ইবন আব্দুল্লাহ আল-উকাইলী বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম সালাত ব্যতীত অন্য কোনো
আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী মনে করতেন না।" (সুনান তিরমিযী)

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।"

উল্লিখিত ও অন্যান্য দলীলসমূহ নামাজ পরিত্যাগকারী বড় কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ; যদিও সে পরিত্যাগকারী ব্যক্তি নামাজ ফরয হওয়াকে অস্বীকার না করে। আর এ মত পোষণ করেন ঈমাম আহমদ রহ. এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন:

أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة

"সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দীনের যা হারাবে তাহলো আমানত এবং সর্বশেষ দীনের যা হারাবে তাহলো সালাত"। (বাইহাকী হাদীসটিকে তার শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন)।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, "সুতরাং ইসলাম থেকে চলে যাওয়া সর্বশেষ বস্তু যখন সালাত তখন যে বস্তুর শেষ চলে যায় সে বস্তু সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এ জন্য আপনাদের দীনের সর্বশেষ অংশ (সালাত)-কে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরুন, আল্লাহ আপনাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।" (ইমাম আহমদের কিতাবুস সালাত)

বর্তমান যুগে আমাদের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কুফুরীর ফাতওয়া দিয়েছেন, আর তাদের শীর্ষে রয়েছেন, মাননীয় (সাবেক) মুফতী শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায ও আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীন রহ.।

নামাজ পরিত্যাগকারীর ফাতওয়ার ভিত্তিতে কতিপয় বিধান আরোপ হয়

ক) নামাজ পরিত্যাগকারীর ইহকালীন বিধান: সালাত আদায়কারী মুসলিম নারীর সাথে বেনামাযীর বিয়ে দেওয়া নাজায়েয। তার অভিভাবকত্ব বিলুপ্ত, তার জবাহকৃত মাংস খাওয়া নাজায়েয, সে তার কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে না। তেমনি তার আত্মীয়গণও

তার থেকে কোনো অংশের অধিকারী হবে না, মারা গেলে তার জানাযা আদায় করা যাবে না, তার ক্ষমা ও করুণার জন্য দো‘আ করা যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না এবং সে দীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তার থেকে বিমুখ হওয়া ও তার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করা ওয়াজিব।

(শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীনের “সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান” নামক রিসালা থেকে সংকলিত)

(খ) সালাত পরিত্যাগকারীর পরকালীন বিধান:

(১) বেনামাযীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে, যেমন সহীহ বুখারীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্বপ্নের বর্ণনায় রয়েছে: “তিনি চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় একটি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন, অতঃপর সে উক্ত পাথর দিয়ে তার (শায়িত ব্যক্তির) মাথায় আঘাত করছে, যার ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে, পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফিরা মাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে তাকে ঐ ভাবেই (শাস্তি) দিচ্ছে যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন দুই ফিরিশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, এতো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ত, কিন্তু তার প্রতি আমল করত না এবং ফরয নামাজ ছেড়ে ঘুমাত।

আমার প্রিয় ভাইবোনরা! দেখুন কত বড় শাস্তি, শুধু এই জন্য যে বেনামাযী ফরয নামাজকে মাথায় বড় বোঝা মনে করত, তাই মাথায় পাথর মেরে মেরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

২) কিয়ামতের দিন কাফির সরদার কারূন, ফির‘আউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে বেনামাযীর হাশর হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে:

«من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلفٍ»

“যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির‘আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ইমাম আহমদ রহ. এ হাদীসকে সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরীর ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা বড় বড় কাফিরদের সাথে বেনামাযীর হাশর হওয়ার জন্য তার

কুফুরী সাব্যস্ত হওয়া চাই। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "এই চার জনকে বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের নেতা।

(৩) বেনামাযী জাহান্নামে যাবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣﴾ [المدثر: ٤٢، ٤٣]

"তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৩]

(৪) বেনামাযী স্বীয় পরিবার এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله»

"যে ব্যক্তির আসর সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।" (সহীহ মুসলিম)

অতএব, যে সমস্ত সালাত ছেড়ে দেয় তার কি অবস্থা হবে?

(৫) বেনামাযীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের এক খালে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾ [مريم: ٥٩]

"তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই "গাইয়া" প্রত্যক্ষ করবে।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯]

আপনি কি জানেন "গাইয়া" কী? গাইয়া হলো, জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ, যার গভীরতা অনেক, যেখানে রয়েছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ। (তাফসীর ইবন কাসীর) গাইয়ার উক্ত তাফসীর আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেমন ইবনুল কাইয়্যেম রহ. কিতাবুস সালাতে উল্লেখ করেছেন।

নামাজের সময়

নামাজের সময় ৪ টি।

১.নিষিদ্ধ সময়।

২.মকরুহ সময়।

৩.মূল সময়.

৪.মুস্তাহাব সময়।

১.নামাজের নিষিদ্ধ সময়

ক.সূর্যদয়ের সময়।
খ.সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে।
গ.সূর্য যখন অস্ত যায়।

তিন সময়ে সালাত পড়া নিষেধ হওয়ার বিষয়ে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত রয়েছে।

উকবা বিন আমের জুহানী রাযি. বলেন,

ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضِيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

"তিনটি সময়ে রাসূল সা. আমাদেরকে সালাত পড়তে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়, যতোক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে নিয়ে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। আর যখন সূর্য অস্ত যায়।" সহীহ মুসলিম-১৩৭৩।

দিবারাত্রে পাঁচটি সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ; মহানবী (ﷺ) বলেন,

(১) "আসরের নামাযের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত আর কোন নামায নেই এবং

(২) ফজরের নামাযের পর সূর্য না ওঠা পর্যন্ত আর কোন নামায নেই।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৪১ নং)*

উক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে এবং মুর্দা দাফন করতে নিষেধ করতেন;

(৩) ঠিক সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে একটু উঁচু না হওয়া পর্যন্ত,

(৪) সূর্য ঠিক মাথার উপর আসার পর থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং

(৫) সূর্য ডোবার কাছাকাছি হওয়া থেকে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত। *(মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, আবূদাঊদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান, ইবনে মাজাহ্‌, সুনান, মিশকাত ১০৪০ নং)*

যেহেতু এই সময়গুলিতে সাধারণত: কাফেররা সূর্যের পূজা করে থাকে তাই। *(মুসলিম, মিশকাত ১০৪২ নং)*

নামায নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এটি হল সাধারণ নির্দেশ। কিন্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা কিছু সময়ে কিছু নামাযকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। যেমন:-

১। ফরয নামায বাকী থাকলে তা আদায় করার সুযোগ হওয়া মাত্র যে কোন সময়ে সত্বর পড়ে নেওয়া জরুরী। মহানবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এবং সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের এক রাকআত নামায পেয়ে যায়, সে (যথাসময়ে) নামায পেয়ে যায়।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬০১নং)*
তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এক রাকআত নামায পায়, সে যেন (সূর্য ডুবে গেলেও) তার বাকী রাকআত নামায সম্পন্ন করে নেয়। আর যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের এক রাকআত নামায পায়, সে যেন (সূর্য উঠে গেলেও) তার বাকী রাকআত নামায সম্পন্ন করে নেয়।” *(বুখারী, মিশকাত ৬০২নং)*

২। অনুরুপ কোন ফরয নামায পড়তে ভুলে গিয়ে থাকলে তা স্মরণ হওয়া মাত্র সত্বর যে কোন সময়ে অথবা ঘুমিয়ে গিয়ে থাকলে জাগার পর উঠে সত্বর যে কোন সময়ে আদায় করা জরুরী। মহানবী (ﷺ) বলেন, “কেউ ঘুমিয়ে গেলে তা তার শৈথিল্য নয়। শৈথিল্য তো জাগ্রত অবস্থাতেই হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কেউকোন নামায পড়তে ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে যাবে, তখন তার উচিৎ, তা স্মরণ (বা জাগ্রত) হওয়া মাত্র পড়ে নেওয়া। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তুমি নামায কায়েম কর।” *(মুসলিম, মিশকাত ৬০৪নং, কুরআন মাজীদ ২০/১৪)*

৩। দিন-দুপুরে মসজিদে জুমুআহ পড়তে এসে ইচ্ছামত নফল নামায পড়া বিধেয়। এ নামাযও নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। *(মিশকাত ১০৪৬নং)*

৪। ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দু’ রাকআত সুন্নত পড়তে সময় না পেলে ফরযের পর তা পড়া যায়। আল্লাহর রসূল (ﷺ) একদা এক ব্যক্তিকে দেখলেন ফজরের ফরয নামাযের পর দু’ রাক্আত নামায পড়ল। তিনি তাকে বললেন, “ফজরের নামায তো দু’ রাকআত মাত্র!” লোকটি বলল, ‘আমি ফরযের পূর্বে দু’ রাকআত পড়তে পাই নি, এখন সেটা পড়ে নিলাম।’ এ কথা শুনে তিনি নীরব থাকলেন। (অর্থাৎ, মৌনসম্মতি জানালেন।) *(আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, মিশকাত ১০৪৪)*

৫। কারণ-সাপেক্ষ যাবতীয় নামায যথার্থ কারণ উপস্থিত হওয়া মাত্র যে কোন সময়েই পড়া যায়। যেমন :-

ক- কা’বা শরীফের তওয়াফের পর দু’ রাকআত নামায। তওয়াফ শেষ হওয়ার পরেই যে কোন সময়ে ঐ নামায পড়া যায়। মহানবী (ﷺ) বলেন, “হে আব্দে মানাফের বংশধর! দিবারাত্রের যে কোন সময়ে কেউএ গৃহের তওয়াফ করে নামায পড়লে তাকে তোমরা বাধা দিও না।” *(আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, নাসাঈ, সুনান, মিশকাত ১০৪৫ নং)*
খগু তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (মসজিদ-সেলামী) দু’ রাকআত নামায। যে কোনও সময়ে মসজিদ প্রবেশ করে বসার ইচ্ছা করলে বসার পূর্বে এই নামায পড়তে হয়। মহানবী (ﷺ) বলেন, “তোমাদের কেউমসজিদ প্রবেশ করলে সে যেন দু’ রাকআত নামায পড়ার পূর্বে না বসে।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭০৪নং)*

গ- সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের নামায। মহানবী (ﷺ) বলেন, “সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে তাতে গ্রহণ লাগে না। সুতরাং গ্রহণ লাগা দেখলে তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর, তকবীর পড়, নামায পড় এবং সদকাহ্ কর।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৮৩ নং)*

ঘ- জানাযার নামায। আসর ও ফজর নামাযের পরও জানাযার নামায পড়া যাবে। অবশ্য শেষোক্ত তিন সময়ে এই নামায বৈধ নয়। যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। *(আজামে ১৩০-১৩১পৃ:)*

সুতরাং সাধারণ নফল নামায উক্ত সময়গুলিতে নিষিদ্ধ। তবে আসরের পর সূর্য হলুদবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ নয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ২৫৪৯ নং)*

নামাজের মকরুহ সময়

এমন কিছু সময় রয়েছে যে সময়ে নামাজ পড়া মাকরুহ। কোরআন ও হাদিস অনুসারে যা অপছন্দনীয় করা হয়েছে তাকে মাকরুহ বলে। তাই সেসব সময়ে নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকতে হয়। নিচে নামাজের মাকরুহ সময়গুলো তুলে ধরা হলো।

এক.

ফজরের সময় হওয়ার পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ব্যতীত আর কোনো নামাজ পড়া মাকরুহ। (মুসলিম ১১৮৫)

দুই.

ফজর নামাজের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়া মাকরুহ। (বুখারি ৫৫১)

তিন.

আসরের নামাজ আদায়ের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামাজ পড়া মাকরুহ। (বুখারি ৫৫১)

চার.

ইকামতের সময় নামাজ পড়া মাকরুহ। (মুসলিম ১১৬০)

পাঁচ.

ঈদের নামাজের আগে ঈদগাহে কোনো নামাজ পড়া মাকরুহ। (বুখারি ৯৬৪, মুসলিম ৮৮৪, আল-মাজমু ৫/১৭, আলমুগনি ২/২৭৯)

ছয়.

ঈদের নামাজের পরে ঘরেও কোনো নামাজ নেই, ঈদগাহেও নেই। (ইবনে মাজাহ ১২৮৩)

সাত.

সময় যদি এত কম হয় যে সুন্নত পড়তে গেলে ফরজ নামাজের সময় শেষ হয়ে যাবে, এমন সময় নামাজ পড়া মাকরুহ।

আট.

খুব ক্ষুধা ও খানার প্রতি তীব্র চাহিদা হলে সে সময় নামাজ পড়া মাকরুহ। এর ফলে খানার সঙ্গেই মন লেগে থাকবে, নামাজের সঙ্গে নয়। (মুসলিম ৮৬৯)

নয়.

প্রস্রাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নামাজ পড়া মাকরুহ। (মুসলিম ৮৬৯)

নামাজের মূল সময়

ফরয নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য এক শর্ত হল, তা যথা সময়ে আদায় করা। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া ভিন্ন সময়ে নামায হয় না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَّوْقُوْتاً

অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে নামায পড়া মু'মিনদের কর্তব্য। (কুরআন মাজীদ ৪/১০৩) কুরআন মাজীদে কতিপয় আয়াতে নামাযের ৫টি ওয়াক্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর নামায কায়েম কর দিনের দু' প্রান্তভাগে (অর্থাৎ ফজর ও মাগরেবের সময়) ও রাতের প্রথমাংশে (অর্থাৎ এশার সময়)। (কুরআন মাজীদ ১১/১১৪)

"সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত (অর্থাৎ যোহ্‌র, আসর, মাগরেব ও এশার) নামায কায়েম কর, আর কায়েম কর ফজরের নামায।" (কুরআন মাজীদ ১৭/৭৮)

"আর সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজরে) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসরে) তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির কিছু সময়ে (এশায়) এবং দিনের প্রান্তভাগগুলিতে (ফজর, যোহ্‌র ও মাগরেবে), যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।" (কুরআন মাজীদ ২০/১৩০)

পাঁচ ওয়াক্তকে নির্দিষ্ট করতে আল্লাহর তরফ হতে স্বয়ং জিবরীল (আহমাদ, মুসনাদ) এসে ইমাম হয়ে রসূল (ﷺ)কে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়েন। নবী (ﷺ) বলেন, "কা'বাগৃহের নিকট জিবরীল (আহমাদ, মুসনাদ) আমার দু'বার ইমামতি করেন; প্রথমবারে তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের নামায তখন পড়লেন, যখন সূর্যঢলে গিয়ে তার ছায়া জুতোর ফিতের মত (সামান্য) হয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়েছিল। অতঃপর আমাকে নিয়ে মাগরেবের নামায পড়লেন তখন, যখন রোযাদার ইফতার করে ফেলেছিল। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে।) অতঃপর এশার নামায তখন পড়লেন, যখন (সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের অস্তরাগ) লাল আভা অদৃশ্য হয়ে

গিয়েছিল। আর আমাকে নিয়ে ফজরের নামায তখন পড়লেন, যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের নামায তখন পড়লেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়েছিল। আসরের নামাযে আমার ইমামতি তখন করলেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়েছিল। অতঃপর আমাকে নিয়ে মাগরেবের নামায তখন পড়লেন, যখন রোযাদার ইফতার করে ফেলেছিল। অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হলে তিনি এশার নামায পড়লেন। আর আমাকে নিয়ে ফজরের নামায তখন পড়লেন, যখন (ভোর) ফর্সা হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! এ হল আপনার পূর্বে সকল নবীগণের ওয়াক্ত। আর এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী ওয়াক্তই হল নামাযের ওয়াক্ত।' (আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, মিশকাত ৫৮৩নং)

শেষ অক্তে নামায যদিও শুদ্ধ, তবুও প্রথম (আওয়াল) অক্তে নামায পড়া হল শ্রেষ্ঠ আমল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন, "আওয়াল অক্তে নামায পড়া।" (সহীহ আবূদাঊদ, সুনান ৪৫২, সহীহ তিরমিযী, সুনান ১৪৪, মিশকাত ৬০৭নং)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল (ﷺ) শেষ জীবন পর্যন্ত দ্বিতীয় বার কখনো শেষ অক্তে নামায পড়েন নি।' (সহীহ তিরমিযী, সুনান ১৪৬, মিশকাত ৬০৮নং)

১.ফজরের সময়:

সুবহে সাদেক উদিত হলে ফজরের নামাযের সময় শুরু হয় এবং রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়। (সুবহে সাদেক বলা হয় সেই সময়কে, যে সময়ে ভোরের আভা পূর্ব আকাশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্থির্ণ অবস্থায় দেখা যায়।) আর এর শেষ সময় হল সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

তবে এই নামায প্রথম ওয়াক্তে 'গালাসে' (একটু অন্ধকারে কাক ভোরে) পড়া উত্তম।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল (ﷺ) ফজরের নামায পড়তেন। অতঃপর মহিলারা তাদের চাদর জড়িয়েই নিজ নিজ বাসায় ফিরে যেত। কিন্তু অন্ধকারের জন্য তাদেরকে চেনা যেত না।' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৯৮নং)*

আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, 'একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) তখন ফজরের নামায পড়লেন, যখন কেউ তার পাশ্ববর্তী সঙ্গীর চেহারা চিনতে পারত না অথবা তার পাশে কে রয়েছে তা জানতে পারত না।' *(আবূদাঊদ, সুনান ৩৯৫, ৩৯৮নং)*

আবূ মাসঊদ আনসারী (রাঃ) বলেন, তিনি [নবী (ﷺ)] একবার ফজরের নামায অন্ধকারে (খুব ভোরে) পড়লেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার ফর্সা করে পড়লেন। এরপর তাঁর ফজরের নামায

অন্ধকারেই হত। আর ইন্তেকাল অবধি কোন দিন পুনর্বার (ফজরের নামায) ফর্সা করে পড়েন নি।' *(আবূদাঊদ, সুনান ৩৯৪নং)*

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "তোমরা ফজরের নামায ফর্সা করে পড়। কারণ, তাতে সওয়াব অধিক।" *(আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, নাসাঈ, সুনান, মিশকাত ৬১৪নং)*

এই হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, 'ফজর স্পষ্টরূপে প্রকাশ হতে দাও, নিশ্চিতরূপে ফজর উদিত হওয়ার কথা না জেনে নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করো না।' অথবা 'তোমরা ফজরের নামায লম্বা ক্বিরাআত ধরে ফর্সা করে পড়। এতে অধিক সওয়াব লাভ হবে।' আর এ কথা বিদিত যে, মহানবী (ﷺ) নিজে এই নামাযে (কখনো কখনো) ৬০ থেকে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন এবং যখন নামায শেষ করতেন, তখন প্রত্যেকে তার পাশের সাথীকে চিনতে পারত। *(বুখারী ৫৯৯নং)*

অথবা ' চাঁদনী রাতে একটু ফর্সা হতে দাও। যাতে ফজর হওয়া স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়।'

(আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ২/১১৪-১১৫)

যেহেতু তাঁর আমল মৃত্যু পর্যন্ত ফজরের নামায ফর্সা করে ছিল না, বরং এ নামায একটু অন্ধকার থাকতেই শুরু করতেন, সেহেতু উক্ত হাদীসের এই সব ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত।

২.যোহরের সময়:

সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে ঢলে গেলেই যোহরের আওয়াল ওয়াক্ত শুরু হয়। আর প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে তার সময় শেষ হয়ে যায়।

সূর্য মধ্য রেখায় থাকলে কোন খোলা জায়গায় একটি সরল কাঠি বা শলাকা সোজাভাবে গাড়লে যখন তার ছায়া তার দেহে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর পূর্ব দিকে পড়ে লম্বা হতে লাগবে, তখনই হবে যোহরের সময়। এইভাবে তার ছায়া তার সমপরিমাণ হলে যোহরের সময় শেষ হয়ে যাবে।

অন্যথা সূর্য মধ্যরেখায় না থাকলে, কোন গোলার্ধে থাকার ফলে যে অতিরিক্ত ছায়া পড়ে, তা বাদ দিয়ে মাপতে হবে। কাঠির ছায়া কমতে কমতে ঠিক মধ্যাহ্নকালে আবার বাড়তে শুরু হবে। ঐ বাড়া অংশটি মাপলে যোহ্র-আসরের সময় নির্ণয় করা যাবে।

প্রত্যেক নামায তার প্রথম ওয়াক্তে পড়াই হল উত্তম। কিন্তু গ্রীষ্মকালে কঠিন গরমের দিনে যোহরের নামায একটু ঠান্ডা বা দেরী করে পড়া আফযল।

আবূ যার (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী (ﷺ) এর সাথে এক সফরে ছিলাম। যোহরের সময় হলে মুআযযিন আযান দিতে চাইল। নবী (ﷺ) বললেন, "ঠান্ডা কর।" এইরূপ তিনি দুই অথবা তিন বার বললেন। তখন আমরা দেখলাম যে, ছোট ছোট পাহাড়গুলোর ছায়া নেমে

এসেছে। পুনরায় নবী (ﷺ) বললেন, "গ্রীষ্মের এই প্রখর উত্তাপ দোযখের অংশ। অতএব গরম কঠিন হলে নামায ঠান্ডা (দেরী) করে পড়।"

(বুখারী ৫৩৯নং, মুসলিম, আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান)।

গ্রীষ্মকালে নিজের ছায়া ৩ থেকে ৫ কদম হলে এবং শীতকালে ৫ থেকে ৭ কদম হলে যোহরের সময় নির্ণয় করা যায়। *(আবূদাঊদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান, মিশকাত ৫৮৬নং)।* অবশ্য সকল দেশেই এ মাপ সঠিক হবে না।

৩.আসরের সময় :

যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে যায়, তখন আসরের সময় শুরু হয়। *(আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, মিশকাত ৫৮৩নং)* শেষ হয় ঠিক সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্তে। মহানবী (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এক রাকআত পেয়ে নেয়, সে আসর পেয়ে নেয়।" *(বুখারী, মুসলিম, সহীহ)*

আসরের আওয়াল ওয়াক্তেই নামায পড়া মহানবী (ﷺ) এর আমল ছিল। আনাস (রাঃ) বলেন, 'সূর্য যখন আকাশের উচ্চতায় প্রদীপ্ত থাকত, তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) আসরের নামায পড়তেন। তাঁর সাথে নামায পড়ে অনেকে মদিনার পার্শ্ববর্তী বস্তীতে (কোন কাজে বা নিজের বাড়ি ফিরে) যেত, আর যখন সেখানে পৌঁছত তখনও সূর্য (অপেক্ষাকৃত) উচ্চতায় থাকত। পরন্তু কোন কোন বস্তী মদীনা থেকে প্রায় ৪ মীল (১৬ হাজার হাত, প্রায় ৭ কিমি) দূরে অবস্থিত ছিল।' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৯২নং)*

রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর সাথে আসরের নামায পড়তাম। অতঃপর উট নহ্র (যবেহ্) করা হত, তারপর তার মাংস দশ ভাগ করা হত। সেই মাংস সূর্য ডোবার পূর্বেই রান্না করে খেতে পেতাম।'

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬১৫নং)

বিনা ওজরে আসরের নামায শেষ সময়ে দেরী করে পড়া মাকরূহ। মহানবী (ﷺ) বলেন, "এটা তো মুনাফিকের নামায; যে সূর্যের অপেক্ষা করে যখন তা হলদে হয়ে শয়তানের দুই শিঙের মাঝে আসে, তখন সে উঠে (কাকের বা মুরগীর দানা খাওয়ার মত) চার রাকআত ঠকাঠক পড়ে নেয়। যাতে সে আল্লাহর যিক্র কমই করে থাকে।"

(মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, নাসাঈ, সুনান, মিশকাত ৫৯৩নং)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করে সে ব্যক্তির আমল পন্ড হয়ে যায়।"

(বুখারী ৫৫৩, নাসাঈ)

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, “যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল।” *(মালেক, বুখারী ৫৫২, মুসলিম ৬২৬ নং প্রমুখ)*

৪.মাগরিবের সময়:

সূর্য অস্ত গেলেই মাগরেবের সময় হয় এবং পশ্চিমাকাশে লাল আভা (অস্তরাগ) কেটে গেলেই এর সময় শেষ হয়ে যায়। *(মুসলিম, সহীহ)*

মাগরেবের নামাযও আওয়াল ওয়াক্তে পড়া আফযল এবং বিনা ওজরে দেরী করে পড়া মাকরুহ। কেননা, জিবরীল *(আহমাদ, মুসনাদ)* মহানবী (ﷺ) এর ইমামতি কালে ২ দিনই একই সময়ে আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িয়েছিলেন- যেমন পূর্বেকার হাদীস হতে আমরা জানতে পেরেছি। তাছাড়া রাফে’ বিন খাদীজ (রাঃ) বলেন, ‘আমরা নবী (ﷺ) এর সাথে মাগরেবের নামায পড়তাম। অতঃপর নামায সেরে যদি আমাদের কেউ তীর মারত, তাহলে সে তার তীর পড়ার স্থানটি দেখতে পেত।’ (অর্থাৎ, বেশী অন্ধকার হত না।) *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৯৬নং)*

মহানবী (ﷺ) বলেন, “আমার উম্মতের লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী ফিতরাত (প্রকৃতির) উপর থাকবে, যতক্ষণ তারা তারকারাজি (আকাশে) প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই মাগরেবের নামায পড়ে নেবে।” *(আহমাদ, মুসনাদ, ত্বাবারানী, মু’জাম, আবূদাঊদ, সুনান,হাকেম, মুস্তাদরাক, মিশকাত ৬০৯নং)*

৫.এশার সময়:

সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশ হতে লাল আভা কেটে গেলে এশার সময় উপস্থিত হয়। নু’মান বিন বাশীর (রাঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী (চাঁদের মাসের) তৃতীয় রাতে চাঁদ ডুবে গেলে এশার সময় হয়।

(আবূদাঊদ, সুনান, দারেমী, সুনান, মিশকাত ৬১৩নং) সূর্য ডোবার পর থেকে ঘড়ি ধরে দেড় ঘন্টা অতিবাহিত হলে এই ওয়াক্ত আসে।

আর এর শেষ সময় অর্ধেক রাত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য কোন ওযর ও বাধার ফলে ফজরের আগে পর্যন্ত এশার নামায পড়ে নিলে আদায় হয়ে যায়। যেহেতু মহানবী (ﷺ) বলেন, “কেউ ঘুমিয়ে যাওয়ার ফলে নামায না পড়লে তা শৈথিল্য বলে গণ্য হবে না। অবশ্য জাগ্রতাবস্থায় যদি কেউ নামায না পড়ে এবং অন্য নামাযের সময় উপস্থিত হয়ে যায়, তবে তার শৈথিল্যই ধর্তব্য।” *(মুসলিম, সহীহ ৬৮১নং)*

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আগামী নামাযের সময় এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান নামাযের সময় অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য ফজরের নামাযের সময় শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। সূর্য উদয়ের সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যায়। যোহ্‌র পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। *(ফিকহুস সুন্নাহ্‌ উর্দু৭৫পৃ:)*

আওয়াল অক্তে নামায আফযল হলেও এক তৃতীয়াংশ বা মধ্যরাতে (শেষ অক্তে) এশার নামায পড়া আফযল। মহানবী (ﷺ) বলেন, "আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য না জানলে আমি এশার নামাযকে এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তে তাদেরকে আদেশ দিতাম।" *(আহমাদ, মুসনাদ, তিরমিযী, সুনান, ইবনে মাজাহ্, সুনান, মিশকাত ৬১১নং)*

প্রিয় রসূল (ﷺ) এশার নামাযকে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দেরী করে পড়তে পছন্দ করতেন এবং এশার পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলাকে অপছন্দ করতেন। *(বুখারী ৫৯৯, মুসলিম, প্রমুখ)* যাতে এশা, তাহাজ্জুদ, বিতর ও ফজরের নামায যথা সময়ে পড়া সহজ হয়।

তবে দ্বীন অথবা জরুরী বিষয়ে কথাবার্তা বলা ও ইলম চর্চা করা দূষনীয় নয়। যেমন আল্লাহর রসূল (ﷺ) আবূ বকর ও উমারের সাথে এশার পর জনসাধারণের ভালো-মন্দ নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। *(আহমাদ, মুসনাদ, তিরমিযী, সুনান ১৬৯নং)*

নামাজের মুস্তাহাব সময়

১। দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার স্থানের দিকে, রুকু অবস্থায় উভয় পায়ের পাতার উপর, সেজদার সময় নাকের দিকে, বৈঠকের সময় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০৩)

২। তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় হাত চাদর থেকে বাহিরে বের করে রাখা।

৩। সালাম ফিরানোর সময় উভয় কাঁধের উপর দৃষ্টি রাখা। (মারাকিল ফালাহ-১৫১)

৪। নামাজে মুস্তাহাব পরিমান ক্বেরাত (ফজর ও যোহরে তিওয়ালে

মুফাস্যাল, সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত। আছর ও ইশাতে আওসাতে মুফাস্যাল, সূরা তরেক থেকে বায়্যিনা পর্যন্ত। মাগরীবে কিসারে মুফাস্যাল সূরা যিলযাল থেকে শেষ পর্যন্ত।) পড়া। (ফাতাওয়া শামী-২/২৬১)

৫। জুমআর দিন ফজরের নামাজে প্রথম রাকাতে সূরা আলিফ, লাম, মিম সেজদা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহর পড়া। (ফাতাওয়া শামী-২/২৬৫)

৬। যথা সম্ভব কাঁশি ও ঢেকুর চেপে রাখা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭৬)

৭। হাই আসলে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭৭)

নামাযের সময় নির্দিষ্টী করণের পশ্চাতে হিকমত

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে এমন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি দান করেছেন, যাতে রুযী অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাকে জীবনধারণ করতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন পরিশ্রমের। পরিশ্রম দেহ্-মনে ক্লান্তি, ব্যস্ততা ও শৈথিল্য আনে। ফলে পরিশ্রমে ছিন্ন হয় আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বিশেষ যোগসূত্র। তাই তো যথাসময়ে সেই যোগসূত্র -একটানা নয় বরং মাঝে মাঝে কায়েম করে বান্দাকে আল্লাহ-মুখো করে রাখার উদ্দেশ্যে নামাযের ওয়াক্তের এই বিশেষ সময়াবলী নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে পরিশ্রম ও উপার্জনের জন্যও উদ্যম জরুরী। বিশেষ করে ফজরের সময়ে এমন কিছু অনুশীলনের দরকার, যার মাঝে নিদ্রার জড়তা ও আলস্য কেটে গিয়ে মনে স্ফূর্তি ফিরে আসে এবং যার ফলে এই বর্কতের সময়ে মানুষ নিজ নিজ কাজে মনোযোগী হতে পারে। তাই তো ফজরের নামাযের মাধ্যমে বান্দা তার নিদ্রা অবস্থায় নিরাপত্তা লাভের উপর আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এবং আল্লাহর নিকট তওফীক ও সাহায্য কামনার মধ্য দিয়ে শুরু করে তার প্রাত্যহিক কর্মজীবন।

পরিশ্রম ও ব্যস্ততার মাঝে ঠিক দিন দুপুরে মানুষ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে একটু বিরতির সাথে বিশ্রাম নিয়ে থাকে। এই বিশ্রামের সময় সে তার নিজ কর্মের উপর তওফীক লাভের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে আল্লাহর নিকট। অতঃপর আসরের সময় উপস্থিত হলে পুনরায় বান্দা তার বাকী দিনের কর্ম সম্পন্ন করার মানসে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। মাগরেবের সময় হলে বান্দা নিজ গৃহে ফিরে কর্ম সম্পাদন করার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক মাগরেবের নামায পড়ে। অতঃপর সময় আসে বিশ্রাম ও আরামের। এই সময় বান্দা প্রাত্যহিক কর্ম সেরে সারা দিনে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ অনুগ্রহের উপর শুক্র জানিয়ে এশার নামায পড়ে। আর এইভাবে সে প্রত্যহ্ কর্ম ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে নিজের কাল যাপন করে থাকে। কোন সময় আত্মবি স্মৃ ত হয়ে পাপের প্রতিঢলে পড়লে নামায তাকে বাধা দেয়। আল্লাহর আযাব ভীষণ কঠিন এবং তাঁর অনুগ্রহ অনন্ত-অসীম -এ কথা প্রত্যহ্ পাঁপ-পাঁচ বার বান্দাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। *(মাজমূউস স্বালাওয়াতি ফিল-ইসলাম, ড: শওকত উলাইয়ান ৯১-৯২পৃ:)*

নামাজের আহকাম সমূহ

আহকাম শব্দটি বহুবচন, একবচনে হুকুম। এগুলো হলো সালাতের বাইরের ফরয সালাতের শর্তসমূহকে আহকাম বলা হয়ে থাকে। সালাতের আহকাম সাতটি।

১. শরীর পাক (অর্থাৎ সালাতের আগে ওযু করে পবিত্র হতে হবে, আর গোসল ফরয হলে আগে গোসল করে নিতে হবে),
২. কাপড় পাক,
৩. জায়গা পাক,
৪. সময় হওয়া,
৫. সতর ঢাকা,
৬. কিবলামুখী হওয়া,
৭. নিয়ত করা।

১.শরীর পাক:

এ জন্য অজুর দরকার হলে অজু বা তায়াম্মুম করতে হবে, গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ বলেন,

بيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذا قُمْتُمْ إلى الصلوة فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ِ
"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর-"।

২.কাপড় পাক হওয়া।

পরনের জামা, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি, শাড়ি- ইত্যাদি পাক পবিত্র হওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وثيابك فطهر আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর।
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, إن هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذْر "নিশ্চয় মসজিদ গুলোতে পেশাব-পায়খানা করা কোনো ক্রমেই সঙ্গত নয়।

৩.জায়গা পাক হওয়া।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, إن هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذْر "নিশ্চয় মসজিদ গুলোতে পেশাব-পায়খানা করা কোনো ক্রমেই সঙ্গত নয়।

৪.সতর ঢাকা।

যার সীমা হচ্ছে পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত আর মহিলাদের জন্য মুখ, হাত ও পা ব্যতীত সমস্ত শরীর।

৫.কিবলামুখী হওয়া।

কিবলা মধ্যে কাবার দিকে মুখ করে সালাত পড়ুন।

مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও।
আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন,

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة....

"যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও, পরিপূর্ণরূপে অযু কর অতঃপর কিবলা মুখী হও।

৬.সময়/ওয়াক্ত হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إن الصلوة كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا " নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত।"।

রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করার প্রমাণ: হাদীসে এসেছে, জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম দিন সালাত আদায়

করা শেখান প্রত্যেক সালাতের শুরু ওয়াক্তে, আর পরের দিন সালাত আদায় করা শেখান প্রত্যেক সালাতের শেষ ওয়াক্তে। অতঃপর বলেন,

يَا مُحَمَّد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

"হে মুহাম্মাদ! এটি তোমার পূর্ববর্তী নবীদের ওয়াক্ত। এ সময়দ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ই হলো নামাজের সময়।

৭.নিয়ত করা।

নামাজ আদায়ের জন্য সেই ওয়াক্তের নামাজের নিয়ত করা আবশ্যক।
নবী সা. বলেন-
إنما الأعمال بالنية
নিশ্চই আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

নামাজের আরকান সমূহ

নামাজ শুরু করার পর নামাজের ভেতরে যেসব কাজ ফরজ, সেগুলোকে নামাজের আরকান বলা হয়ঃযথা-

১.তাকবিরে-তাহরিমা বলা।

২.দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া।

৩.ক্বেরাত পড়া।

৪.রুকু করা।

৫.সিজদা করা।

৬.শেষ বৈঠক করা।

১. তাকবিরে-তাহরিমা বলাঃ

অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্বসূচক শব্দ দিয়ে নামাজ আরম্ভ করা। তবে 'আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ আরম্ভ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّر আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা মুদ্দাসসিরঃ৩)

২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াঃ

মানে কিয়াম করা। আল্লাহ বলেনঃ حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

তোমরা সলাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। (সূরা বাকারাঃ ২৩৮)

৩. ক্বেরাত পড়াঃ

চার রাকাতনিশিষ্ট ফরজ নামাজের প্রথম দু'রাকাত এবং ওয়াজিব,সুন্নাত,নফল নামাজের সকল রাকাতে ক্বিরাত পড়া ফরজ। আল্লাহ বলেনঃ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। (সূরা মুযাম্মিল,আয়াতঃ ২০)

৪. রুকু করাঃ

প্রতিটি নামাজের প্রত্যেক রাকাতে রুকু করা ফরজ।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ অর্থঃআর তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (সূরা বাকারাঃ৪৩)

৫. সিজদা করাঃ

নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সিজদা করা ফরজ।আল্লাহ তাআলা বলেন, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩ অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। (সূরা হজ্জঃ৭৭)

৬. শেষ বৈঠক করাঃ

নামাজের শেষ রাকাতে সিজদার পর তাশাহুদ পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় বসা।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ অর্থ, "অতঃপর ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ করতে পারলে তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে।

নামাজের গুরুত্ব

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর উপর দৈনিক পাঁচ বার নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট কয়েক রাক'আত (মোট ১৭ রাক'আত) নামাজ আদায় করা ফরয। ঈমানের পরে মুসলিমের সবচেয়ে বড় করণীয় নিয়মিত নামাজ আদায় করা। কুরআনে প্রায় শত স্থানে এবং অসংখ্য হাদীসে নামাজের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

কুরআনের আলোকে নামাজই সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন-"মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা অত্যন্ত বিনয় ও মনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করেন।"(সূরা মুমিনুন-১)

অন্যত্র তিনি বলেন। "সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।"*(সূরা আল আলা ১৪-১৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন- সালাত পরিত্যাগের পরিণতি জাহান্নামের মহাশাস্তি। আল্লাহ বলেন: “তাদের পরে আসল অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। কাজেই তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি পাবে।"(সূরা মারইয়াম-৫৯(

জাহান্নামীদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "(তাদের প্রশ্ন করা হবে) তোমাদেরকে জাহান্নামে ঢুকালো কিসে? তারা বলবে: আমরা সালাত আদায় করতাম না..."
(সূরা মুদ্দাস্সির-৪২-৪৩)
যে মুমিন সালাত আদায় করেন; কিন্তু সালাত আদায়ে অনিয়মিত- অমনোযোগী তার পরিণতি বিষয়ে আল্লাহ বলেন: “মহাশাস্তি-মহাদুর্ভোগ সে সকল সালাত আদায়কারীর, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।"*(সূরা মাউন ৪-৫)

সালাত বা নামায মুমিন ও কাফিরের মধ্যে মাপকাঠি। সালাত ত্যাগ করলে মানুষ কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।
রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

*একজন মানুষ ও কুফরী-শিরকের মধ্যে রয়েছে সালাত ত্যাগ করা।""(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

তিনি আরো বলেন: "যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।"*(সহীহ ইবনে হিব্বান)

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে একথা নিশ্চিত যে, সালাত মুসলিমের মূল পরিচয়। সালাত ছাড়া মুসলিমের অস্তিত্ব কল্পনাতীত।
সালাত পরিত্যাগকারী কখনোই মুসলিম বলে গণ্য হতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে করে যে, সালাত না পড়লেও চলে বা কোনো নামালীর চেয়ে কোনো বেনামাযী ভাল হতে পারে- যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে কাফির।

প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ মুসলিম উম্মাহর সকল ইমাম ও ফকীয় এ বিষয়ে একমত। পক্ষান্তরে যে মুসলিম সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সালাত কায্য করা কঠিনতম পাপ, দিনরাত শুকরের গোশত ভক্ষণ করা, মদপান করা, রক্তপান করা ইত্যাদি সকল ভয়ঙ্কর গুনাহের চেয়েও ভয়ঙ্করতর পাপ।

ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত সালাত কাযা করা, সে ব্যক্তি যদি ইচ্ছে করে কোনো সালাত ত্যাগ করে তাহলে তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা হবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ আছে। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে এ প্রকারের মানুষকেও কাফির গণ্য করা হত।

তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক বলেন-

كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركة كفر غير الصلاة

"মুহাম্মাদ এর সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো কর্ম ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।" হাদীসটি সহীহ।(তিরমিজি)

বিশেষত সাহাবীগণের মধ্যে উমার ৬. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ , তাবিয়ীগণের মধ্যে ইবরাহীম নাখয়ী, ফকীহগণের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল, ইমাম ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহি ও অন্যান্য অনেকে এ মত পোষণ করতেন। তাঁদের মতে মুসলিম কোনো পাপকে পাপ জেনে পাপে লিপ্ত হলে কাফির বলে গণ্য হবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম নামাজ। যদি কেউ নামাজ ত্যাগ করা পাপ জেনেও এক ওয়াক্ত নামাজ ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করেন তাহলে তিনি কাফির বলে গণ্য হবেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক ও অধিকাংশ

ফকীহ বলেন, এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা হবে না। তবে তাকে নামাজের আদেশ দিতে হবে এবং সালাত পরিত্যাগের শাস্তি হিসেবে জেল, বেত্রাঘাত ইত্যাদি শাস্তি প্রদান করতে হবে। ইমাম শাফিয়ী বলেন: সালাত আদায়ের আদেশ দিলেও যদি সে তা পালন না করে তবে তাকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।"

আল্লাহর যিকরের জন্য সালাত বা নামাজ:

আমরা এ পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে সালাত বা নামাযের মূল নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। তবে প্রথমে কয়েকটি মূল বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে:

প্রথম বিষয়: মহান প্রতিপালক মালিক আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে হৃদয়কে পবিত্র, পরিশুদ্ধ, আবিলতামুক্ত ও ভারমুক্ত করার জন্য সালাত বা নামায। সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি অনেক বিধান রয়েছে। সবই সাধ্য অনুসারে। এজন্য সাধ্যের বাইরে হলে এগুলো রহিত ও মাফ হয়ে যায়, কিন্তু সালাত মাফ হয় না।

আল্লাহ বলেন: "যদি তোমরা বিপদের আশংকা কর তবে হাঁটতে হাঁটতে অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে। "১০

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْه

"তোমার কাছে যদি কুরআনের কিছু থাকে তবে তা পাঠ কর; আর তা না হলে তুমি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বল। "১১

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সকল মাযহাব ও মতের ফকীহগণ মূলত একমত যে, ওযরে বা বাধ্য হলে মুমিন অযু ছাড়া, বসে, শুয়ে, অপবিত্র পোশাকে, উলঙ্গ অবস্থায়, যে কোন দিকে মুখ করে, হাঁটতে হাঁটতে, দৌড়াতে দৌড়াতে, সূরা-কিরাত ছাড়া, শুধু সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি যিক্রের মাধ্যমে সালাত আদায় করবেন। কিন্তু কোন কারণেই তিনি স্বেচ্ছায় এক ওয়াক্ত সালাত কাযা করতে পারবেন না। যতক্ষণ হুঁশ আছে বা হৃদয়ে আল্লাহর 'মরণ করার ক্ষমতা আছে ততক্ষণ তার সালাত রহিত বা মাফ হয়

না। তাকে সময় হলে সাধ্যানুসারে রাসূলুল্লাহ -এর শেখানো পদ্ধতিতে তাঁর প্রভুর দরবারে হাযিরা দিয়ে তাঁকে স্মরণ করে হৃদয়কে প্রশান্ত করতেই হবে। নইলে তার হৃদয় ও আত্মা মৃত্যুবরণ করবে। ফিকহের গ্রন্থগুলির বিভিন্ন স্থানে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে মৌলিক কোনো মতভেদ নেই।

মানুষকে স্বভাবত সমাজের মধ্যে বাস করতে হয়। সারা দিনের কর্মময় জীবনে বিভিন্নমুখী আবেগ, ভালবাসা, ঘৃণা, হিংসা, রাগ, বিরাগ, ভয়, লোভ ইত্যাদির মধ্যে পড়তে হয়। এগুলো তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত, অসুস্থ ও কলুষিত করে তোলে। শুধুমাত্র মাঝে মাঝে আল্লাহর স্মরণ, তাঁর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে নিজের আবেগ, বেদনা ও আকুতি পেশ করার মাধ্যমেই মানুষ এ ভয়ানক ভার থেকে নিজের হৃদয়কে মুক্ত করতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়: এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মহান আল্লাহর যিক্র বা স্মরণই হলো সালাতের মূল বিষয়। যিক্র বা স্মরণ হৃদয় দিয়ে করতে হয় এবং মুখ তাকে পূর্ণতা দেয়। এজন্য নামাযের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর স্মরণ করা ও নামাযের মধ্যে যা কিছু পাঠ করা হয় তার অর্থের দিকে লক্ষ রাখা ও অর্থের সাথে হৃদয়কে আলোড়িত করা অতীব প্রয়োজন। মহান আল্লাহ বলেছেন: "এবং আমার যিক্র বা স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর।"১২ হৃদয়হীন স্মরণহীন সালাত মুনাফিকের সালাত। মহান আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন: "আর যখন তারা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন অলসতাভরে দাঁড়ায়, তারা মানুষকে দেখায় এবং খুব কমই আল্লাহর যিক্র (স্মরণ) করে। "১৩

তৃতীয় বিষয়: নামাযের অন্যান্য নিয়মাবলি পালনের ক্ষেত্রে ওযর বা অসুবিধা থাকলেও যিক্র বা স্মরণের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা কখনোই থাকে না। আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন, যেভাবেই সালাত আদায় করি না কেন, যে যিক্র বা কিরাআতই পাঠ করি না কেন, নামাযের মধ্যে পঠিত দু'আ, যিকর বা কিরাআতের অর্থের দিকে মন দিয়ে মনকে আল্লাহর দিকে রুজু করে অন্তরের আবেগ দিয়ে সালাত আদায়ের চেষ্টা করতে পারি। মনোযোগ নষ্ট হলে আবারো মনোযোগ ফিরিয়ে আনে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা নামাযের অন্যান্য প্রয়োজনীয়, অল্পপ্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে অতি সচেতন হলেও মনোযোগ, আবেগ ও ভক্তির বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখাই না।

সাহাবীগণ নামাযে মনোযোগের জন্য খুবই সচেষ্ট থাকতেন। এক সাহাবী তাঁকে বলেন, শয়তান আমার ও আমার নামাযের (মনোযোগ আনয়নের) মধ্যে বাধ সাধে এবং আমার

কিরাআত এলোমেলো করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ বলেন: "ঐ শয়তানের নাম: খিনযিব। যখন এরূপ অনুভব করবে তখন: (আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম, অর্থাৎ: আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে) পাঠ করে তোমার বাম দিকে থুথু ফেলবে। তিনবার করবে।" এতে মনোযোগ ফিরে আসে।

চতুর্থ বিষয়: আরো দুঃখজনক বিষয়, অনেক ধার্মিক মুসলিম দ্রুত সালাত আদায়ের জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। ধীর ও শান্তভাবে পরিপূর্ণ আবেগ ও মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করাই কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা। মাত্র কয়েক রাক'আত সালাত এভাবে মাসনূন পদ্ধতিতে আদায় করলে হয়ত ১০ মিনিট সময় লাগবে। আর তাড়াহুড়ো করে আদায় করলে হয়ত ৩/৪ মিনিট কম লাগবে। আমরা সারাদিন গল্প করতে পারি। মসজিদ থেকে বেরিয়ে গল্প করে সময় নষ্ট করতে পারি, কিন্তু নামাযের মধ্যে তাড়াহুড়ো করি ও অস্থির হয়ে পড়ি। এ তাড়াহুড়ো সালাতকে প্রাণহীন করে দেয়।

বে-নামাযীর পরিণতি

মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে আমরা এমন অনেকেই আছি যারা শুধু মনে করি নামায পড়া ভালো কাজ। কিন্তু আমরা জানি না ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নামাযের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটুকু? এটাও জানি না যে, নামায পরিত্যাগের মধ্যে একজন বনী আদমের জন্য কত ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। আবার কেউ কেউ শুধু এতটুকু জানি যে, বে-নামাযীর গুনাহটা হবে শুধু পরকালে। অতএব, অন্তত: এখনতো ভালোই আছি। কেউ আবার ভাবি, বয়সতো তেমন হয়নি।সময় হোক...। অর্থাৎ নামায যেন বুড়াকালের আমল।

আবার কেউ কেউ বলি, নামায শুরু করবো। তবে কাল থেকে...। শয়তানের প্ররোচনায় সময় হারিয়ে এভাবে যারা দিন পার করে দিচ্ছে তারা আগামীকালের খোঁজ আর পায় না। বরফের মতো সময় তাদের গলে যাচ্ছে। এমনই অবস্থায় হঠাৎ করে মৃত্যু এসে একদিন তাকে ঘেরাও করে ফেলে। অতঃপর তার পরিণতি কী হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত কত করুণ, এ বিষয়ে এখানে ক্ষুদ্র আলোচনা। শুরুতেই আল্লাহ তাআলার বাণী, এরপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা এবং সর্বশেষে উলামায়ে কিয়ামের ফাতাওয়া:

ক. প্রথমত:

১. আল কুরআনে বলা হয়েছে,

"অতঃপর এমন এক সময় আসল যখন লোকেরা নামায ছেড়ে দিল, আর লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে গেল।ফলে তারা শীঘ্রই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়ে যাবে। তবে কিছু লোক এ থেকে রেহাই পাবে, যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে।" (সূরা ১৯; মারইয়াম ৫৯-৬০)।

২. আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

"(পরকালে জান্নাতবাসীরা ঠাট্টার ভাষায় দোযখবাসীদের জিজ্ঞেস করবে) কী অপরাধ তোমাদেরকে আজ আগুনে ঢুকিয়েছে? উত্তরে তারা বলবে-আমরা নামায পড়তাম না, আর মিসকীনকে খাবার দিতাম না।" (সূরা ৭৪; মুদ্দাসছির ৪২-৪৪)

৩. আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

"তারা ঈমান আনেনি, নামাযও পড়েনি। বরং উল্টো তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং (ঈমান থেকে) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।অহংকারের সাথে বাড়ি ফিরে গিয়েছে, পরিবারপরিজনের কাছে।(অতএব, হে বেঈমান, হে বে-নামাযী!) তোমার জন্য দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ!

আবারও বলছি, তোমার জন্য দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ! মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়া) এমনিই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে?” (সূরা ৭৫; কিয়ামাহ ৩১-৩৬)

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন,

“(কিয়ামতের) দিন হাঁটুর নিম্নাংশ উন্মুক্ত করা হবে, আর (বেনামাযীদেরকে ডাকা হবে তাদের রবকে সিজদা করার জন্য। কিন্তু সেদিন তারা তা (শত চেষ্টা করলেও) পারবে না। তাদের দৃষ্টি থাকবে ভীত বিহ্বল এবং অবস্থা হবে অত্যন্ত অপমানজনক। (দুনিয়ার জীবনে যখন) তাদেরকে (নামাযের) সিজদার জন্য ডাকা হতো (তখন তা তারা করেনি)। অথচ তারা তখন ছিল সুস্থ (ও সক্ষম)। (সূরা ৬৮; কলম ৪২-৪৩) উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (র) একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তা হলো, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেন, আমাদের রব তাঁর পায়ের গোছা উন্মুক্ত করবেন। তখন প্রত্যেক মুমিন নর-নারী তাকে সিজদা করবে।(কিন্তু বেনামাযীরা সেদিন তা পারবে না।)

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন,

“যখন তাদের বলা হতো রুকু কর (অর্থাৎ নামায পড়) তখন তারা রুকু করত না (অর্থাৎ নামায পড়তো না) সত্যকে যারা মিথ্যা বলতো ঐসব লোকদের জন্য ধ্বংস।” (সূরা ৭৭; মুরসালাত ৪৮)। যারা এ যিকির (সালাত আদায় করবে না তাদের জীবন হবে সংকুচিত (কঠিন) এবং কিয়ামতের দিন হাশরে উঠবে তারা অন্ধ অবস্থায়।

“(হ্যা,) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জন্যে (জীবনে) বাঁচার সামগ্রী সংকুচিত হয়ে যাবে, (সর্বোপরি) তাকে আমি কিয়ামতের দিন অন্ধ বানিয়ে হাজির করবো।” (সূরা ২০; ত্বা-হা ১২৪)

খ. দ্বিতীয়ত: বে-নামাজীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হুঁশিয়ারী:

তাদের ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

৬. রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, “একজন মুসলমান ও শির্ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায পরিত্যাগ করা। (অর্থাৎ নামায যে কেউ ছেড়ে দেয়, সে লোক আর কাফের মুশরিকের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না) (মুসলিম)

৭. অপর এক হাদীসে তিনি আরো বলেছেন, "আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামায নিয়ে। যে ব্যক্তি এ নামায ছেড়ে দিল সে কুফরী করল (বা কাফের হয়ে গেল)।" (আহমাদ ও আবু দাউদ)

৮. "যে ব্যক্তি তার সালাত হেফাযত করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য থাকবে নূর, প্রমাণ ও নাজাত। আর যে ব্যক্তি তার সালাতের হেফাযত করবে না তার জন্য কোন নূর নেই, নাজাত নেই, মুক্তির জন্য তার পক্ষে কোন দলীল থাকবে না এবং কিয়ামতের দিন কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফ (এসব কাফির মুশরিকদের) সাথে তার হাশর হবে।" (মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ ইবনে হিব্বান) অর্থাৎ, হাশরের মাঠে মুসলমানদের কাতারে সে দাঁড়াতে পারবে না। নাউযুবিল্লাহ!

গ. তৃতীয়ত: সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনদের উক্তি

৯. দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করল ইসলামে তার জন্য আর কোন কিছুই রইল না।"

১০. তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেন, "নবী (স)-এর সাহাবাগণ একমাত্র নামায তরক করা ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে উল্লেখ করেননি।" (তিরমিযী) অর্থাৎ নামাযই একমাত্র ইবাদত যা পরিত্যাগ করাকে তারা কুফরী বলে বর্ণনা করেছেন।

ঘ. চতুর্থত: মাযহাবের ইমাম ও বিজ্ঞ ফকীহগণের মতামত

সার্বক্ষণিকভাবে নামায তরক করে চলছে এমন সব বেনামাযীদের সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় আরো যেসব হুঁশিয়ারি এসেছে এসবের আলোকে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের ফাতাওয়া আরবী ও বাংলা গ্রন্থাবলিতে রয়েছে। এর মধ্য থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়া নিম্নে তুলে ধরা হলো, যদিও এ মাসআলাগুলোতে ইমাম ও ফকীহগণের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু মতবিরোধ রয়েছে, এগুলো হলো:

১১. বেনামাযীর শেষ নিঃশ্বাস: বেনামাযীর মৃত্যুকালে ফেরেশতারা তার মুখমণ্ডল ও নিতম্বে প্রহার করতে থাকবে (সূরা ৮; আনফাল ৫০-৫১)। এজন্য বেনামাযীদের কারো কারো চেহারা কালোবর্ণ ধারণ করে থাকে।

১২. জানাযা: বেনামাযীর জানাযা পড়াও জায়েয নেই। যেহেতু নামায না পড়া কুফরী কাজ। আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। অপর একদল আলেমের মতে, তার জানাযা পড়া যেতে পারে। কারণ, সে মুসলিম পরিবারের সন্তান। তবে আলেমরা তার জানাযা পড়বে না। পড়বে সাধারণ কিছু লোক।

১৩. কবর দেওয়া: মুসলমানের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তার কবর হবে দূরদূরান্তে আলাদা কোন জায়গায়। যেহেতু বেনামাযীর জন্য বিভীষিকাময় শাস্তির হুঁশিয়ারি রয়েছে সেহেতু এ আযাব যেন কোন মুসলমানের কবরের পাশে না হয়। সেজন্য তার কবর হবে ভিন্ন জায়গায়। কবরের আযাবের ভয়ে বেনামাযী ও পাপিষ্ঠ লোকদের লাশ দাফনের আগেই চিৎকার করতে থাকে। এত বিকট আওয়াজে এ লাশ চিৎকার করে যে, পশুপক্ষী ও প্রাণীকূলের সকলেই এ আওয়াজ শুনতে পায়। শুধু শুনে না মানুষ ও জ্বিন জাতি। যদি তাদের মধ্যে কেউ লাশের কান্নার এ বিকট আওয়াজ শুনতে পেত তাহলে ভয়ে ভীতবিহ্বল হয়ে জীবিত লোকেরাও হুঁশ হারিয়ে ফেলত।

১৪. কবরের অবস্থা: তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হবে। লোহার লম্বা হাতলবিশিষ্ট ভারী হাতুড়ি নিয়ে একজন ফেরেশতা প্রস্তুত থাকবে। এ ফেরেশতা তাকে এমন জোরে আঘাত করতে থাকবে যার ফলে তার দেহটা মাটিতে মিশে যাবে।

১৫. হাশর পরকাল: কারূন, ফেরাউন ও হামানের সাথে তার হাশর হবে। চেষ্টা করেও মুসলমানদের কাতারে এসে বেনামাযীরা দাঁড়াতে পারবে না। দোযখের আগুন হবে তাদের। চিরস্থায়ী আবাস।

১৬. বিবাহ বন্ধন: কোন কোন ফকীহর মতে স্ত্রী নামাযী হলে বেনামাযী স্বামীর সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।(তবে যদি বিপরীতে স্ত্রী বেনামাযী হয় আর স্বামী নামাযী হয় সেক্ষেত্রে বিবাহ চলতে পারে ।)।

১৭. সম্পদ প্রাপ্তি: কোন বেনামাযী তার রক্ত সম্পর্কের লোকদের কাছ থেকে ওয়ারিশসূত্রে কোন সম্পদ পাবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তিটি বেনামাযী হয় তাহলে তার সম্পদও তার নিকটাত্মীয়রা পাবে না। উক্ত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

১৮. সাহচর্য কোন বেনামাযীরই সঙ্গী সাথী হওয়া জায়েয নেই। তার কাছ থেকে দূরে থাকা ও তাকে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। তবে দাওয়াতী কাজের জন্য, তাকে সদুপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য তার সঙ্গী হওয়াতে কোন বাধা নেই।

১৯. পশু জবাই: তার জবাইকৃত পশুর মাংস খাওয়া জায়েয নেই।

২০. মক্কায় প্রবেশ: মক্কা ও হারামের সীমানার মধ্যে বেনামাযীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

২১. জাগতিক অবস্থা: তার জীবন হবে কষ্টদায়ক, সংকীর্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক। অতএব, আপনি যদি নামাযী হয়ে থাকেন তাহলে সত্যিই আপনি বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান। আর তা না হলে নিজেই ভেবে দেখুন আপনি মুসলমান আছেন কিনা?

নামাজের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা জানি যে, আল্লাহকে খুশি করার জন্য কোন ইবাদত করা হলে তা কবুল হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। সেগুলোর অন্যতম হলো যে, উক্ত ইবাদত রাসূলুল্লাহ- ﷺ এর সুন্নাত বা শিক্ষা ও পদ্ধতি অনুসারে পালন করতে হবে। তাঁর শিক্ষার বাইরে ইবাদত করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেখানো পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে হবে। তিনি বলেছেন: "আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ, সেভাবে তোমরা সালাত আদায় করবে। "

হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর প্রাজ্ঞ ইমাম ও ফকীহগণ সালাত আদায়ের নিয়মাবলি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। সামান্য কয়েকটি বিষয়ে হাদীসের বর্ণনা বিভিন্ন প্রকারের হওয়ার কারণে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। এখানে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আলোচনা করছি।

১. অযু, গোসল বা তায়াম্মুম করে পবিত্র হয়ে, পবিত্র কাপড় পরে সতর

আবৃত করে, বিনম্র ও শান্ত মনে কিবলামুখী হয়ে নামাযে দাঁড়ান। পুরুষদের জন্য সদাসর্বদা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা ফরয। সালাতের মধ্যে এ অংশটুকু আবৃত করে রাখা ফরয। কেউ দেখুক বা না দেখুক শরীরের এ অংশের মধ্যে কোনো স্থান অনাবৃত হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে কাপড় একদম না থাকলে উলঙ্গ

অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে হবে। এছাড়া কাঁধ ও শরীরের উপরিভাগ আবৃত করা সুন্নাত। মুমিনের উচিত মহান প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর পছন্দনীয়, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করা।

মহিলাদের জন্য সালাতের মধ্যে শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত বাদে মাথার চুলসহ মাথা ও পুরো শরীর আবৃত করা ফরয। সালাতের মধ্যে যদি কোনো মহিলার কান, চুল, মাথা, গলা, কাঁধ, পেট, পায়ের নালা ইত্যাদি পূর্ণ বা আংশিক অনাবৃত হয়ে যায় তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণভাবে শাড়ি মুসলিম মহিলার জন্য অসুবিধাজনক পোশাক। ঢিলেঢালা পুরো হাতা সেলোয়ার-কামিজ বা ম্যাক্সি মুসলিম মহিলার জন্য উত্তম ও আদর্শ পোশাক। সর্বাবস্থায় সাধারণ পোশাকের উপর অতিরিক্ত বড় চাদর দিয়ে ভালভাবে নিজেকে আবৃত করে সালাত আদায় করতে হবে। মাথার চুল, কান, গলা ইত্যাদি ভালভাবে আবৃত রাখার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

২. সামনে সুতরা বা আড়াল রাখুন। দেয়াল, খুঁটি, পিলার বা যে কোন কিছুকে সামনে আড়াল হিসেবে রাখুন। না হলে অন্তত একহাত বা আধাহাত লম্বা সরু কোন লাঠি, কাঠ ইত্যাদি সামনে রাখলেও সুতরার সুন্নাত আদায় হবে। যথাসম্ভব সুতরার কাছে দাঁড়াতে হবে, যেন সাজদা করলে সুতরার নিকটে হয়। রাসূলুল্লাহ। সুতরার তিন হাতের মধ্যে দাঁড়াতেন।

রাসুলুল্লাহ। বলেন: "যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তখন সামনে আড়াল রাখবে এবং আড়ালের কাছাকাছি দাঁড়াবে", "আড়াল বা সুতরা ছাড়া সালাত আদায় করবে না, আর কাউকে তোমার সামনে দিয়ে (সুতরার ভিতর দিয়ে) যেতে দেবে না। যদি সে জোর করে তাহলে তার সাথে মারামারি করবে (শক্তভাবে বাধা দেবে), কারণ তার সাথে শয়তান রয়েছে।

ইসলামের প্রথম যুগে সুতরার এত গুরুত্ব প্রদান করা হতো যে, প্রয়োজনে মাথার টুপি খুলে সুতরা বানিয়ে নামায আদায় করা হতো। ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ। অনেক সময় নামায আদায়ের জন্য মাথা থেকে টুপি খুলে টুপিটাকে নিজের সামনে সুতরা বা আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতেন।"" প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ী সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (১৯৮হি:) বলেন, "আমি শারীক ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আবী নামিরকে (১৪০হি:) দেখলাম, তিনি একটি জানাযায় উপস্থিত হয়ে আসরের সময় হলে আমাদেরকে নিয়ে জামাআতে আসরের নামায আদায় করেন। তখন তিনি তাঁর টুপিটি তার সামনে রেখে (টুপিটিকে সুতরা বানিয়ে) নামায আদায় করলেন।

৩. মনে মনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের জন্য সালাত আদায়ের নিয়ত করুন। মুখে নাওয়াইতুআন, ইত্যাদি বলা সুন্নাতের খেলাফ।

৪. তাকবীর (আল্লাহ আকবার। বলে দু হাত কাঁধ পর্যন্ত অথবা কান পর্যন্ত উঠান। এ সময়ে হাতের আঙুলগুলো স্বাভাবিকভাবে সোজা থাকবে। একেবারে মিলিত থাকবে না, আবার বিচ্ছিন্নও থাকবে না। হাতের তালু কিবলার দিকে থাকবে।

৫. বাঁ হাতের পিঠ, কজি ও বাজুর উপর ডান হাত রাখুন, অথবা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরুন। এ ভাবে হাত দুটি নাভী বা পেটের উপরে

রাখুন।

৬. নামাযের মধ্যে সবিনয়ে সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখুন। এদিক- সেদিক দৃষ্টিপাত করবেন না, উপরের দিকে তাকাবেন না। হাদীসে বলা হয়েছে, "যারা নামায রত অবস্থায় উপর দিকে তাকায়, তাদের অবশ্যই তা থেকে বিরত হতে হবে, অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে।*

৭. তাকবীরে তাহরীমার পরে সানা বা শুরুর দু'আ পাঠ করুন।

৮. অনুচ্চ স্বরে (মনে মনে) বলুন:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من

همزه ونفحه ونفثه

(আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব।-নির রাজীম)
আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অথবা বলুন: "আ'উযু বিল্লা-হিস সামী'িয়ল 'আলীমি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম, মিন হামযিহী, ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফসিহী: 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে, তার প্রবঞ্চনা, জ্ঞান নষ্টকারী ও অহংকার সৃষ্টিকারী প্ররোচনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতের 'সানা' পাঠের পর বলতেন। "আ'উযু... মিন হামযিহী, ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফসিহী।" হাদীসটি সহীহ।

৯. এরপর অনুচ্চস্বরে (মনে মনে) বলুন। "বিসমিল্লা-হির রাহমা- নির রাহীম।" অর্থাৎ (পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।)

১০. এরপর অর্থের দিকে লক্ষ রেখে প্রার্থনার আবেগে প্রতিটি আয়াতে থেমে থেমে সূরা ফাতিহা পাঠ করুন। সূরা ফাতিহা পাঠ করা সালাতের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। তবে যদি কেউ সূরা ফাতিহা না জানেন, তাহলে তা শিখতে থাকবেন। যতদিন শেখা না হবে ততদিন সূরা পাঠের পরিবর্তে তাসবীহ তাহলীল করবেন। বলবেন: (সুব'হা-নাল্লা-হ), (আল' হামদু লিল্লা-হ), (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ), আল্লা-হু আকবার), (লা- 'হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

১১. সুরা ফাতিহা পাঠ শেষ হলে "আমীন" বলবেন। "আমীন" শব্দের অর্থ "হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন।" এরপর কুরআনের অন্য কোন সুরা বা কিছু আয়াত পাঠ করুন। তিলাওয়াত শেষে সামান্য একটু থামুন। এরপর "আল্লাহ আকবার" বলে রুকু করুন। রুকু অবস্থায় দুহাত দুহাঁটুর উপর দৃঢ়ভাবে রাখুন, হাতের আঙুল ফাঁক করে হাঁটু আঁকড়ে ধরুন। দুবাহুকে ও দুহাতের কুনুইকে দেহ থেকে সরিয়ে রাখুন। এ অবস্থায় পিঠ লম্বা করে দিতে হবে, পিঠ কোমর ও মাথা এমন ভাবে সোজা ও সমান্তরাল থাকবে যে পিঠের উপর পানি ঢেলে দিলে তা গড়িয়ে পড়বে না। এ ভাবে রুকুতে পুরোপুরি শান্ত ও স্থির হয়ে যেতে হবে। রুকুর তাসবীহ পাঠ করুন।

১২. রুকু থেকে উঠে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ান ও কয়েক মহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকুন। রুকু ও সাজদা থেকে উঠে কয়েক মুহূর্ত পরিপূর্ণ সোজা থাকা সালাতের অন্যতম ওয়াজিব। রুকু থেকে উঠে পুরোপুরি সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সাজদায় চলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। এ অবস্থায় মাসনূন যিকরগুলো পালন করুন।

১৩. এরপর আলাহু আকবার বলতে বলতে শান্তভাবে সাজদা করবেন। সাজদা করার সময় প্রথম দুহাঁটু এরপর দুহাত অথবা প্রথম দুহাত এরপর দুহাঁটু মাটিতে রাখা- উভয় প্রকার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাজদা অবস্থায় দুপা, দুহাঁটু, দুহাত, কপাল ও নাক মাটিতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকবে। দুহাতের আঙুল মিলিত অবস্থায় সোজা কিবলামুখি থাকবে। দুহাতের পাতা দু'কানের নিচে অথবা দুকাঁধের নিচে থাকবে। দুহাতের বাজু ও কনুই মাটি থেকে উপরে থাকবে এবং কোমর থেকে দূরে সরে থাকবে। সাজদার সময়ে নাক মাটি থেকে উঠবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে: "যতক্ষণ কপাল মাটিতে থাকবে, ততক্ষণ নাকও মাটিতে থাকবে, অনথ্যায় সালাত শুদ্ধ হবে না। "

সাজদার সময় পায়ের আঙুল কিবলামুখি থাকবে। অনেক ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, দাঁড়ানো অবস্থায় যেমন দু পায়ের মাঝে ৪ আঙুল বা এক বিঘত ফাঁক থাকে সাজদার সময়েও একইভাবে পদদ্বয় পৃথক থাকবে। অন্যান্য ফকীহ বলেছেন, সাজদার সময় দুপায়ের গোড়ালি একত্রিত থাকবে। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আলামা ইবনু আবিদীন শামী রুকুর নিয়ম প্রসঙ্গে বলেন:

ويس أن يلصق كعبيه (قال السيد أبو السعود وكذا في السجود أيضا

"সুন্নাত হলো মুসালী তার পায়ের গোড়ালিদুটি একত্রিত করে রাখবে। সাইয়েদ আবুস সাউদ বলেন। সাজদার মধ্যেও এভাবে পায়ের গোড়ালিদ্বয় একত্রিত রাখা সুন্নাত। এ মতটি সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ তাহাজ্জুদ আদায় করছিলেন। আমি অন্ধকারে হাত বাড়ালাম-

موجدته ساجدا راضا عليه مستقبلاً بأطراف أصابعه القتلة

"আমি স্পর্শ করে দেখলাম তিনি সাজদায় রত, তাঁর পায়ের গোড়ালিদ্বয় একত্রিত করে পায়ের আঙুলগুলির প্রান্ত কিবলামুখি করে রেখেছেন।

১৪. সাজদায় স্থির ও শান্ত হতে হবে। রাসুলুল্লাহ (ছ) বলেন: "সাজদা করবে এবং সাজদায় এমন ভাবে শান্ত হবে যেন তোমার সকল অস্থি ও জোড় শান্ত ও শিথিল হয়ে যায়।" তিনি বলেন, "দৃঢ়ভাবে কপাল, নাক ও দুহাত মাটিতে রেখে সাজদায় স্থির থ াকবে, যেন তোমার দেহের সকল অস্থি নিজ নিজ স্থানে থাকে। " এ অবস্থায় সাজদার তাসবীহ পাঠ এবং দু'আ করুন।

১৫. "আল্লাহ আকবার" বলতে বলতে সাজদা থেকে উঠে বসতে হবে এবং সম্পূর্ণ স্থির হতে হবে যেন শরীরের সকল অস্থি নিজ নিজ স্থানে স্থির হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, সালাত শুদ্ধ হতে হলে দুসাজদার মাঝে অবশ্যই স্থির হয়ে বসতে হবে। রাসূলুল্লাহ * যতক্ষণ রুকু

এবং সাজদায় থাকতেন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ও দু সাজদার মাঝে বসে প্রায় তত সময় কাটাতেন।

১৬. এ সময়ে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর শান্ত হয়ে বসতে হবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে পা সোজা রাখতে হবে। দু হাত দু উরু ও হাঁটুর উপরে থাকবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক সামান্য ফাঁক অবস্থায় কিবলামুখী থাকবে। এ সময়ে মাসনূন যিকর পাঠ করুন।

১৭. এরপর "আল্লা-হু আকবার" বলে দ্বিতীয়বার সাজদা করতে হবে। দ্বিতীয় সাজদাতে প্রথম সাজদার মত শান্ত ও স্থিরভাবে অবস্থান করতে হবে এবং উপরে বর্ণিত যিকর ও দু'আ পাঠ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে রুকু, সাজদা, রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ও দুই সাজদার মাঝে বসে শান্ত হওয়া এবং তাড়াহুড়া না করা নামাযের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে অবহেলা করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কষ্ট করে নামায পড়েও তা যদি নবীজির () শিক্ষার বিরোধিতার কারণে আল্লাহ কবুল না করেন তাহলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ বলেছেন, "যে মুসলী পুরোপুরি শান্তভাবে রুকু সাজদা আদায় করে না, তার সালাতের দিকে আল্লাহ তাকান না। তিনি একব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি অপূর্ণভাবে রুকু সাজদা করতে দেখে বলেন "যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে মুহাম্মাদের ড্র ধর্মের উপর তার মৃত্যু হবে না। কাক যেমন রক্তে ঠোকর দেয় তেমনি এরা সালাতে ঠোকর দেয়। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ভাবে রুকু করে না এবং ঠুকরে ঠুকরে সাজদা করে তার অবস্থা হলো সেই ব্যক্তির মত যে অত্যধিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি বা দু'টি খেজুর খেল, যাতে তার কোন রকম ক্ষুধা মিটল না।

তিনি বলেন, "সবচেয়ে খারাপ চোর যে নিজের সালাত চুরি করে।"
সাহাবীরা প্রশ্ন করেন, "হে আল্লাহর রাসূল, নিজের সালাত কীভাবে চুরি করে?" তিনি বলেন, "সালাতের রুকু ও সাজদা পুরোপুরি আদায় করে না। তিনি একদিন সালাত আদায় করতে করতে লক্ষ্য করেন যে একব্যক্তি রুকু ও সাজদা করার সময় স্থির হচ্ছে না। তিনি সালাত শেষে বলেন, "হে মুসলিমগণ, যে ব্যক্তি রুকুতে এবং সাজদায় পুরোপুরি স্থির ও শান্ত না হবে, তার সালাত আদায় হবে না।"

১৮. এরপর "আল্লা-হ আকবার" বলতে বলতে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতে হবে। সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় পরিপূর্ণ আদব ও ভক্তির সাথে শান্তভাবে প্রথমে দুই হাত,

তারপর দুই হাঁটু মাটি থেকে উপরে উঠাতে হবে। উপরের নিয়মে দ্বিতীয় রাক' আত আদায় করতে হবে।

১৯. দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ হলে তাশাহহুদের জন্য বসতে হবে। দুই সাজদার মাঝে মাঝে যেভাবে বসতে হয়, সেভাবে বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে আঙুলগুলো কিবলামুখী করে বসতে হবে। বাম হাত স্বাভাবিকভাবে বাম উরু বা হাঁটুর উপর বিছানো থাকবে। ডান হাত ডান উরুর উপর থাকবে, ডান হাতের আঙ্গুলগুলো মুঠি করে শাহাদাত আঙ্গুলী বা তর্জনী দিয়ে তাশাহহুদ ও দু'আর সময় কিবলার দিকে ইঙ্গিত করা সুন্নাত। চোখের দৃষ্টি ইঙ্গিতরত তর্জনীর দিকে থাকবে। দুরাক'আত সালাত হলে তাশাহহুদের পর দরুদ ও দু'আ পাঠ করতে হবে। তিন বা চার রাক'আত সালাত হলে তাশাহহুদ পড়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ ও দু'আ পাঠ করতে হবে।

২০. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হবে। ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে "আস্সালা-মু আ'লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ' এরপর বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে "আসসালা-মু আ'লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"।

২১. সালামের সাথে সাথে সালাত শেষ হয়ে যায়। সালামের পরে নামাযের আর কোন কর্ম-ফরয, ওয়াজিব,সুন্নাত, মুস্তাহাব কিছুই বাকি থাকে না।

বুখারী (১৪-কিতাবুল আযান, ১৮-বাবুল আযান লিলমুসাফির...) ১/২২৬, নং ৬০৫ (ভা. ১/৮৮)

আবু দাউদ (কিতাবুস সালাত, বাবুদ দুনওয়ি মিনাস সুতরাতি) ১/১৮২-১৮৩, নং ৬৯৭-৬৯৮ (ভা ১/১০১); ইবনু মাজাহ (৫-কিতাব ইকামাতিস সালাত, ৩৯-বাব ইদরা মাসতাতা'তা) ১/৩০৬-৩০৭, নং ৯৫৪-৯৫৫ (ভা ১/৬৭); সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/৯, ১৭, ২৬-২৭; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬/১২৬।

. সুয়ূতী, আল-জামি'হুস সাগীর ২/৩৯৪, নং ৭১৬৮, মুনাবী, ফয়যুল কাদীর ১/৩৬৭, আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর, পৃ: ৬৬৫, নং ৪৬১৯।

. আবূ দাউদ (কিতাবুস সালাত, বাবুল খাড়ি ইযা লাম ইয়াজিদ আসা) ১/১৮১, নং ৬৯১ (ভা. ১/১০০)।

নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় উপকারিতা, ফলাফল ও ফযীলত

প্রিয় পাঠক! দুনিয়া ও আখিরাতে পরকালে সালাতের অনেক উপকারিতা রয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপে কতিপয় উল্লেখ করা হলো:

১। সালাত বা নামাজ হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

২। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎ সালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে সালাতের হিফাযত করল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।" (ইতোপূর্বে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)

৩। সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱسۡجُدۡ وَٱقۡتَرِب﴾ [العلق: ١٩]

"আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।" [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো'আ কর।" (সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ)

প্রিয় পাঠক! দেখুন সালাতই হচ্ছে আপনার ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। অতএব,আপনি যদি চান তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে (সালাতের মাধ্যমে) বেশি-বেশি সাজদাহ ও রুকুর মাধ্যমে এ সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে বেশি-বেশি দো'আ করার ওসীয়ত করেছেন।

৪। সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফ্ফারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফ্ফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।" (সহীহ মুসলিম)

প্রিয় পাঠক! উক্ত হাদীসের শেষ অংশের দিকে লক্ষ্য করুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে" কেননা কবীরা গুনাহ খাঁটি ও আন্তরিক তাওবা ব্যতীত মাফ হবে না।

৫। সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, "পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা"। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد: ২৮]

"জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।" [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) [طه‏[14 :

"আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।"

[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ- শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।" (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।" (সুনান নাসাঈ)

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন, يَوْمَ

الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه‏[١٢٤ :

"যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন- যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাবো যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রনায় ভুগে।

৭। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ) [البقرة‏[45 :

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও

ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।" (মুসনাদে আহমদ) সাবেত রহ. বলেন, "নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।" (তাফসীর ইবন কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴿ [النمل:62]

"নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?"

[সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে- আপদে চিনবে।” (মুসনাদ আহমদ)

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮। সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
]2[المؤمنون,1 :
অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।" [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) [الاعلا১৫] ،14 :

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫]

আয়াতে উল্লিখিত "ফালাহ" শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

৯। সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّق[١٣]

"এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২] ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে

না।"

১০। সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা:

সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য

দূর্গ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ[5] ِ

তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" [সূরা আল- 'আনকাবূত, আয়াত: ৪৫]

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরই ওসীয়ত করেন এবং বলেন, "যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরের হয় তখন তাদেরকে সালাতের আদেশ কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে সালাতের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও"। (সুনান আবু দাউদ)

১১। সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা- হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ دَابِمُونَ) [المعارج[১৯৩ ,٢ :

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।" [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

১২। সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّبَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّبَهُ عَلَى وَجْهِهِ

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে,

আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ

তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।" (সহীহ

মুসলিম)

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা

অর্জন হয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة[١٠٨ :

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة[١٠٨ :

"আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।

প্রশ্নঃ প্রত্যেক সালাত আদায়কারী কি উপরোক্ত ফযীলত ও উপকারিতা অর্জন করবে?

উত্তরঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তা'আলার বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

]الماعون[: ৪, ৫

"সুতরাং দুর্ভোগ ('ওয়াইল' জাহান্নামের একটি স্থান) সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।" [সূরা আল-মাউন, আয়াত: ৪-৫]

তাফসীরকারকগণ এই আয়াতের তাফসীর করেন যে,

এই আয়াত দ্বারা ঐ সমস্ত লোক বুঝায়, যারা সালাতকে তার সময় থেকে পিছিয়ে অসময়ে আদায় করে। সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন "এরা ঐ সমস্ত মানুষ যারা সালাতকে তার (প্রকৃত সময়ে আদায় না করে পরে আদায় করে"। (তাফসীর ইবন কাসীর)

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুসল্লী (সালাত আদায়কারী) নামে অভিহিত করা সত্ত্বেও তাদেরকে ওয়াইলের হুশিয়ারী দিয়েছেন। কেননা তারা সালাত প্রকৃত সময়ের পরে আদায় করে। অতএব, সালাতকে আপন ওয়াক্ত থেকে পরে আদায় করার জন্য আল্লাহ যাদেরকে ওয়াইলের হুশিয়ারী দিয়েছেন, তারা কীভাবে উপরোক্ত উপকারিতা ও ফযীলতের অধিকারী হবে?

সুতরাং সালাতের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ওয়াক্ত। শর'ঈ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত ওয়াক্ত নষ্ট করা যাবে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) [النساء[: ١٠٣

"নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

ইবন কাসীর রহ. তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

"ইবন আব্বাস "মাওকূতান" এর তাফসীরে ফরয অর্থ নিয়েছেন"। তিনি আরো উল্লেখ করেন: "হজের মতো সালাতেরও সময় নির্ধারিত"। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন: "ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হজের মতো সালাতেরও একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে"।

প্রিয় পাঠক! (আপনার প্রতি আল্লাহ রহম করুন)

সাহাবীগণের যুগের তাফসীরের ইমামদের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কীভাবে হজের মতো সালাতেরও এক নির্ধারিত সময় সাব্যস্ত করেছেন। আর কে আছে এমন যে হজ নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে তা অসময়ে আদায় করবে? সালাতেরও সময় এমনি নির্ধারিত, কোনো শর'ঈ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় না করলে আল্লাহ কবুল করবেন না।

সম্মানিত পাঠক! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: "যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, দলীল- প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে না, বরং কারূন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবন খালাফের সাথে তার হাশর (পুনরুত্থান) হবে"। (মুসনাদে আহমদ)

আর যে ব্যক্তি সালাত ঠিক সময়ে আদায় করল না, সে সালাতের হিফাযতও করল না।

অতএব, সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায়ে তৎপর হোন ও এর প্রতি গুরুত্ব দিন। সালাতের নিয়ম-কানূন শিখার প্রতিও তেমনি তৎপর হউন, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

صلوا كما رأيتموني أصلى

"তোমরা সেভাবে সালাত পড় যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখ।" (সহীহ বুখারী)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল ও সালাত আদায় করল তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম দিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিরে যাও পুনরায় সালাত আদায় কর, কেননা তুমি সালাতই আদায় কর নি। সে তিনবার একইভাবে আদায় করল।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির ওপর বিধান আরোপ করলেন যে, সে নামাজ আদায় করে নি শুধু তার সালাতে স্থিরতা না থাকার কারণে। আর এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়।

অতএব, আমরা পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ফলাফলে পৌঁছতে পারি যে, সালাত অবশ্যই যথাসময়ে আদায় করতে হবে এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতেরই অনুরূপ হতে হবে। তবেই ইনশাআল্লাহ উক্ত সালাত গ্রহণযোগ্য ও উপকারী হবে এবং দুনিয়াতেও তার ফল প্রকাশিত হবে।

উপসংহার

প্রিয় পাঠক! উল্লিখিত প্রমাণ-পঞ্জি নামাজের গুরুত্ব, ফযীলত এবং ইহকাল ও পরকালে তার উপকারিতা ও ফলাফলের স্পষ্ট দলীল।

এই ফলাফল ও ফযীলত নামাজের পুরোপুরি সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্বদানকারীর জন্যই অর্জন হতে পারে, কেননা নামাজের স্থান অতি উচ্চে। ইমাম আহমদ রহ. তার "কিতাবুস সালাতে" বলেন, "তুমি জেনে রাখ! ইসলামে তোমার অংশ আর তোমার নিকট ইসলামের গুরুত্ব ততটুকু যতটুকু সালাতে তোমার অংশ এবং তোমার নিকট সালাতের গুরুত্ব এবং তুমি এমন অ থেকে বাঁচ যে, তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করছ, আস তোমার নিকট ইসলামের কোনো গুরুত্ব নেই, কেননা তোমার অন্তরে ইসলামের ততটুকুই গুরুত্ব হবে যতটুকু তোমার অন্তরে সালাতের গুরুত্ব থাকবে।"

অতএব, প্রিয় দীনি ভাই! যদি আপনি নামাজের ব্যাপারে অথবা নামাজ জামা'আতের সাথে আদায়ে বা ফজরের নামাজে অলসতা করে থাকেন তবে হঠাৎ চলে আসা সমস্ত স্বাদ সাঙ্গকারী সকল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্নকারী মৃত্যু গ্রাস করার পূর্বেই আপনি একান্ত তাওবা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হোন। নতুবা আপনার জন্য অবশিষ্ট থাকবে শুধু আফসোস আর লজ্জা। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন:

قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْعَبُوا أِلَى رَبِّكُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن نَقْرَفُ سَفَرٌ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَتَنى لَكُنتُ مِنَ الْمُتَقَنَ حِدَتَنى لَكُنتُ مِنَ الْمُتَوَلَكُنْتُ تَرَى الْعَذَابَ◌

لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) [الزمر[58 ،53 :

"বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসবার পূর্বে; অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট থেকে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে। যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো

ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩- ৫৮]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সমস্ত গুনাহ-খাতা থেকে তাওবা করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করার ওয়াদা করছেন। কিন্তু তাওবা করার পরে কি করা উচিৎ? আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করব, তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করব এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওবার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা থেকে সাবধান করেন। কেননা মৃত্যু এমন সময় এসে পড়বে যে মানুষ তা বুঝতেও পারবে না, পরে তার জন্য আফসোস ও লজ্জা ব্যতীত আর কিছু থাকবে না।

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ [الزمر[৫৬] :
"যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস!"

[সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৬]

নামাজে শিথিলতাকারী বলবে: হায় আফসোস! আমি নামাজে বা নামাজের জামা'আতে, ফজরের নামাজে বা তা ব্যতীত আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণে শৈথিল্য করেছি। আর ঐ ব্যক্তি স্বীয় গুনাহ-খাতার জন্য আফসোস করবে।

অতএব, আমাদের সবার কর্তব্য, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:

"হে মুমিনগণ তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" [সূরা আন- নূর, আয়াত: ৩১]

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه محمد ﷺ